জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

উপন্যাসের করণকৌশল: প্রসঙ্গ *গড় শ্রীখণ্ড*

কৃষ্ণ কুমার বিশ্বাস*

Abstract

'Garh Shrikhanda' is one of the most enduring and artistic novels authored by Amiya Bhushan Majumdar (1918-2001). In the grand canvas of this epic novel, the writer has artistically portrayed the crisis created in the individual and collective lives because of famine, riot and partition of Bengal that happened in the 40s of 20th century. The aesthetic beauty of this novel is intensely related with its artistic ingenuity. In spite of some researchers' attempt to deal with the content and the historical background of the novel, the necessity of reviewing its formative structure is not inconsequential. The formative structures of this novel 'Garh Shrikhanda' have been analyzed according to the theories of modern novel in the current research. The plot, characters and characterization, the use of point of view, narrative techniques and dexterity of diction are basically prioritized in the discussion of the form of this novel. This epic novel with its panoramic and compound plot is an array of static and dynamic characters. The mighty river Padma is the protagonist here and Ramchandra, Padmo, Surutun, Madhai are the major characters. In revealing the content of the novel as well as the psychology of the characters, the immaculate application of point of view and narrative technique is noteworthy. By using subject related diction, the writer shows intense love to an enduring life in the midst of total disintegration.

গড় শ্রীখণ্ড (১৯৫৭) অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রথম ও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত উপন্যাস।[১] দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের মতো রাজনৈতিক ঘটনা 'সমগ্রদেশের ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে রাজনৈতিক চাঞ্চল্যহীন' পদ্মা-তীরবর্তী বৃহত্তর পাবনার অন্তর্গত চিকন্দি, বুধেডাঙা, চরণকাশি, কাদোয়া, অরণকোলা, বন্দর দিঘা প্রভৃতি অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে ওঠা প্রান্তিক জনপদের অধিবাসীদের জীবনে যে বিপর্যয় ও ভাঙন বয়ে এনেছিল *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে লেখক তারই রূপায়ণ করেছেন সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। ১৯৪৬ সালের মার্চ-এপ্রিল(চৈত্র) থেকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত কালখণ্ডকে ধারণ করা হয়েছে এই উপন্যাসে। কিন্তু এই কালখণ্ডের চলমান জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অতীতের সম্মিলনে লেখক উপন্যাসে স্থান-কালের বিস্তার ঘটিয়ে উপন্যাসটিকে দিয়েছেন মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা। আখ্যানবৃত্তসমূহের শিথিল বন্ধন সত্ত্বেও বিচিত্র শ্রেণি-পেশার অসংখ্য চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার অনুপম প্রকাশ, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবন, বিশেষ করে 'মাটির কাছাকাছি' থাকা মানুষের জীবনের যথাস্থিতবাদী রূপায়ণ এবং বিষয়ানুগ প্রকরণ উপন্যাসটিকে করে তুলেছে শিল্পঋদ্ধ।

জাতীয় জীবনের বৃহৎ রাজনৈতিক অভিক্ষেপ একটি সমাজের সকল প্রান্তের জনজীবনে যে প্রভাব রাখে তার চালচিত্র অঙ্কন করার অভিপ্রায়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার কোন সরল প্লটকে বেছে নেননি। বরং কাহিনির ঐক্যের বিচারে *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে চারটি কাহিনিবৃত্তের সমন্বয়ে একটি যৌগিক প্লট তৈরি হয়েছে। এই চারটি কাহিনিবৃত্তের একটিতে আছে সুরতুন-মাধাই-ইয়াজ-ফতেমা-ইয়াকুব-ইসমাইল-ফুলটুসি-টেপি-টেপির মা-গোঁসাই এর কাহিনি। এদের অনেকেই স্বভাব-অপরাধী যাযাবর সান্দার বংশের অন্তর্গত। দুর্ভিক্ষের সময়ের চাল ব্যবসার সূত্রে এরা রেলের পোর্টার এবং অতীতে গরুকে বিষ দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত মাধাই বায়েনের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। মাধাই ও সুরতুনের সম্পর্কের টানাপড়েন এই বৃত্তের কেন্দ্রীয় বিষয়। দ্বিতীয় বৃত্তটি তৈরি হয়েছে রামচন্দ্র-সনকা-পদ্ম-মুঙলা-ভানমতি-শ্রীকৃষ্ট-ছিদাম এবং চৈতন্য সাহাকে নিয়ে। এরা মূলত কৃষিজীবী। এই বৃত্তের কেন্দ্রে 'গড় শ্রীখণ্ডে'র

---

* প্রভাষক, সরকারি পিসি কলেজ, বাগেরহাট

প্রকৃত ভূমিপুত্র রামচন্দ্রের অবস্থান। জীবনসংগ্রামের জটিলতায় সে যেন একালের 'চাঁদবেনে'। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে যেসব মহাজন শ্রেণির মানুষ অধিক মুনাফা ভোগ ও মজুদদারির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের তীব্রতাকে অনিবার্য করে তুলেছিল চৈতন্য সাহা এই উপন্যাসে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। সান্যালমশাই-অনসূয়া-রূপু-সুমিতি-নৃপ-মনসা-মাস্টারমশাইও নায়েবদের কাহিনি দিয়ে নির্মিত হয়েছে উপন্যাসের তৃতীয় কিন্তু দুর্বল কাহিনিবৃত্ত। লেখক অতি যত্নে, দীর্ঘ পরিসরে এই জমিদার শ্রেণির জীবনচিত্রের অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণির প্রতিভূ হিসেবে এই পরাশ্রয়ী মানুষগুলোর জীবনযন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব কার্যকারণসূত্রে অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> 'ইঁহারা তত্ত্ব ও আদর্শের রাজ্যে বিচরণ করেন, কিন্তু ইঁহাদের জীবনীশক্তি এই তত্ত্ববেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়া স্বতোৎসারিত হয় নাই। ইহার কারণ যে, ইঁহাদের জীবনবোধই অস্বচ্ছ ও গোধূলিছায়াচ্ছন্ন। বৃত্তির সুস্পষ্টতা যে বোধের সুস্পষ্টতা তাহা ইঁহাদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।[২]

চতুর্থ কাহিনিবৃত্তটি সংক্ষিপ্ততম। এটি নিটোল না হলেও গুরুত্বপূর্ণ। মূলত একটি জনপদে হিন্দু-মুসলমানের যে যূথবদ্ধ জীবন গড়ে ওঠে *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসের চতুর্থ বৃত্তটির মাধ্যমে লেখক সেই জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের এই অংশে চরণকাশির আলেফ সেখ-এরফান সেখ, সাকিনদিয়ার হাজি সাহেব ও তার পুত্র ছমির মুন্সি এবং এরফানের শ্যালক মুসলিম লীগের কর্মী কলকাতানিবাসী আল মাহমুদ চরিত্রের ক্রিয়াশীলতা স্থান পেয়েছে। এরফান ও হাজি সাহেব এই বৃত্তের আদর্শিক ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিহীন চরিত্র। নানা উস্কানি সত্ত্বেও আমাদের সমাজে এখনও যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লক্ষ করা যায় এঁদের মতো মানুষের কারণেই তা সম্ভব। যদিও চরিত্র দুটি তেমন পরিস্ফুট নয়। অন্যদিকে আলেফ সেখ সমাজে সম্মানপ্রত্যাশী, কিন্তু যে কর্তব্যবোধ ও স্থৈর্য সেজন্য প্রয়োজন তা তার মধ্যে অনুপস্থিত। তবে তার জীবনমুখীনতা পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। আল মাহমুদ সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি ছড়ানোর অবলম্বন মাত্র। কিন্তু উপন্যাসে তার সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি তাকে প্রাণবন্ত করতে পারেনি। বস্তুত এই উপন্যাসে লেখক অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যাদের অধিকাংশই টাইপধর্মী, যাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বভাবের পূর্ণতার অভাব বিদ্যমান।

গড় শ্রীখণ্ড উপন্যাসে ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের কার্যকারণ সম্পর্ক সর্বদা অনিবার্যরূপে গ্রথিত হয়নি। এমনকি একটি কাহিনিবৃত্তের সঙ্গে অন্য একটি কাহিনিবৃত্তের সম্পর্কও বেশ শিথিল। এগুলো প্যানোর‍্যামিক প্লটের স্বভাববৈশিষ্ট্য। এই ধরনের প্লট 'গড় শ্রীখণ্ডে'র মতো বৃহৎ পরিসরের মহাকাব্যিক উপন্যাসের উপযোগী। এ প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণ মজুদারের মন্তব্যটি স্মরণীয়– 'উপন্যাস সেই মহাকাব্য যা গদ্যে লেখা হয়।'[৩] অর্থাৎ *গড় শ্রীখণ্ডের* মহাকাব্যিক বিস্তার নিঃসন্দেহে লেখকের সচেতন শিল্প-প্রয়াসের ফসল। মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনির সংযোগ, বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের সমাবেশ এবং কাহিনি ও প্রতিবেশের বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি দিলে গঠনগত দিক থেকে *গড় শ্রীখণ্ডের* প্লটকে হর্ম্যাকার বলা যায়। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদারের মতটি প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁর মতে-

> এই কালখণ্ড নিয়ে লেখা উপন্যাসটি কোনো একটি মূল কাহিনির রৈখিক বর্ণনায়ন নয়। চারটি কাহিনিবৃত্ত উপন্যাসের সমগ্রতায় একটি বড় বৃত্তের মধ্যে সম্পর্কান্বিত হয়েছে। হয়ত বলা যাবে হর্ম্যের মতো এই উপন্যাসের গড়ন, অনেকগুলি অধ্যায়-প্রকোষ্ঠ সংবলিত চারটি মহল নিয়ে গড়ে উঠেছে তার স্থাপত্যমহিমা।[৪]

সার্বিক বিচারে *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসের প্লট কাহিনির ঐক্যের বিচারে যৌগিক, উপস্থাপন পদ্ধতির নিরিখে প্যানোর‍্যামিক এবং গঠনরূপের বিচারে হর্ম্যাকার। এমনই জটিল প্লট অমিয়ভূষণ মজুমদার বেছে নিয়েছেন জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য মানুষের সংগ্রামের দিকটিকে রূপায়ণের অভিপ্রায়ে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি যথার্থ।-

> গড় শ্রীখণ্ডে একটি যুগের জাতীয় বেদনা বিপুল ঐকতানে ঝংকৃত হয়েছে। জাতীয় জীবনের একটি চূড়ান্ত বেদনাময় মুহূর্তে একটা গোটা সমাজের কথা চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। জীবনের এই বেদনাকে এই উপন্যাসের সর্বত্র প্রায় হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় ।[৫]

গড় শ্রীখণ্ড উপন্যাসের প্রত্যেকটি আখ্যানবৃত্তের প্রধান চরিত্র থাকলেও কোন নির্দিষ্ট চরিত্র সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তা নিয়ে সমগ্র উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠেনি। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব আখ্যানবৃত্তের অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সীমায়িত থেকেছে। রামচন্দ্র অবশ্য এ ধারায় ব্যতিক্রম। চারটি আখ্যানবৃত্তের বেশকিছু চরিত্রের সঙ্গে তার মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছে। তবে উপন্যাসের অন্যতম সজীব ও প্রাণবন্ত চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও রামচন্দ্র *গড় শ্রীখণ্ড*-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়। অমিয়ভূষণ মজুমদার চরিত্রায়ণের এমন প্যাটার্ন অবশ্য সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন। *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে সামগ্রিক ভাঙনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে পদ্মা তীরবর্তী মানুষের জীবনে 'কীর্তিনাশা', 'গণগামিনী' পদ্মার প্রভাবের কথা লেখকের চেতনায় ছিল সর্বক্ষণ।

পদ্মা নদীর বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের শুরু এবং পদ্মার সর্বনাশা কূলপ্লাবী রূপের পরিচয় আমরা পাই উপন্যাসের শেষে। বলা যায়, পদ্মা নদী সর্ম্পকিত মিথই অমিয়ভূষণ মজুমদারের মানসে *গড় শ্রীখণ্ড*-এর উৎসভূমি। লেখকের ভাষায়–

> আমার মনে যখন সাম্য হয়... আমি যখন একটা প্রস্ফুটিত পদ্মের শিকড়ে, সেই মিথে গিয়ে পৌঁছলাম, যখন পদ্মা জিনিয়াস অব বেঙ্গল হয়ে গেল, যখন আমি দ্বন্দ্ব-ঝগড়ার উপরে চলে গেলাম, আমার কাছে তখন সান্যালমশাই, রামচন্দ্র আর সুরতুন এক, এরা সবাই আমার রক্তেমাংসে তৈরি মনে হল, তখনই লিখতে আরম্ভ করলাম।[৬]

পদ্মার স্রোত যেন প্রবহমান কালের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত। রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ যেন কালের ধারা অনুসরণ করে পদ্মা নদীর স্রোতের মতো এই উপন্যাসের চরিত্রসমূহকে প্রভাবিত করে যাচ্ছে। পদ্মা নদী *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে নিছক প্রতিবেশ হিসেবে উপস্থাপিত নয়। বরং সে নিজেই যেন এই উপন্যাসের মহাপ্রভাবশালী চরিত্র। উনত্রিশ পরিচ্ছেদে পদ্মায় নতুন চর জাগার প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণ জানাচ্ছেন:

> পদ্মার তীরের অনেক ঘটনায় পদ্মা নিজে এসে নায়িকা হয়। কখনো-বা তার কোনো কাজ থেকে সাধারণ মানুষের সোজা জীবনযাত্রা প্রভাবিত হয়। তাদের শ্লথ দীর্ঘপথ অতিবাহিত করার ভঙ্গিতে গতি এসে ঘা দিতে থাকে। দু-এক মাসে দু-এক বছরের পথ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে যায় মানুষ। মাটি এখানে ধ্রুব নয়।[৭]

কালপ্রবাহের প্রতীক এই পদ্মাই *গড় শ্রীখণ্ড*-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। রাজনৈতিক ঘটনাগুলো যেন নিরন্তর কালপ্রবাহে পদ্মার এক একটি বাঁক পরিবর্তনের মতো। ১৯৯৪ সালের একটি সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ একই রকম মত প্রকাশ করেছেন। যেমন:

> ওটার স্ট্রাকচারটাই অন্যরকম। ওটা একটা এরিয়া বাংলাদেশের। বাংলাদেশের প্রোটাগনিস্ট তো পদ্মা। একমাত্র চরিত্র যে প্রোটাগনিস্ট হতে পারে, সে হচ্ছে পদ্মা। আর একজন সেই গড় শ্রীখণ্ড। পদ্মার তীরের বাড়িটা, যা ভেঙে পড়বে, ফাটল দেখা দিয়েছে, সেই বাড়িটা।[৮]

সান্যালদের ঐ বাড়িটা কিন্তু উপন্যাসের উপান্তে এসে অনেকটাই গুরুত্ব হারিয়েছে। শুধু ঐ বাড়িটাই নয়, সান্যালদের আখ্যানবৃত্তটিই *গড় শ্রীখণ্ড*-এর পটভূমি থেকে সরে গিয়েছে। ঔপন্যাসিক যদিও অন্তত নয়টি পরিচ্ছেদে ঐ বাড়িটির অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা করেছেন। চিকন্দি গ্রামে রামচন্দ্রের মতো অতীতচারী মানুষের কাছে বাড়িটি ঐতিহ্যের প্রতীক 'ছিরিখণ্ড' রূপে বিরাজমান। কিন্তু দেশভাগের রাজনৈতিক বিভাজনের পর বাড়িটি হয়ে পড়েছে নিঃসঙ্গ কালের সাক্ষী। পদ্মার প্রলংকারী বন্যার পর ইয়াজ ও সুরতুনের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে ঐতিহ্যবাহী বাড়িটির করুণ রূপ:

> ইয়াজ উঠে দাঁড়িয়েছিলো। দূরে চিকন্দির সান্যালবাড়ির উল্টানো পিরিচের মতো চূড়াটা চোখে পড়লো। সে বললো, 'দ্যাখো'। সুরতুন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।[৯]

মহাকাব্যধর্মী, বৃহৎ আয়তনের *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসের প্যানোর‍্যামিক প্লটে আছে অসংখ্য চরিত্রের ভিড়। কিন্তু চরিত্রসমূহকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্রই সমতল(Flat)। ব্যক্তিস্বভাব নয় বরং শ্রেণিচারিত্র্য এসকল চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য। অনেক চরিত্রই উপন্যাসের শুরুতে পাঠকের হৃদয়ে যে অনুভব সৃষ্টি করে উপন্যাসের শেষে এসেও সে অনুভবের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। সময়, সমাজ ও প্রতিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে *গড় শ্রীখণ্ড*-এর অধিকাংশ চরিত্রে তা অনুপস্থিত। এই উপন্যাসের সুমিতি, মনসা, শ্রীকৃষ্ট, মহিম সরকার, চৈতন্য সাহা, মুঙলা, ছিদাম, কনোক দারোগা, ফতেমা, এরফান প্রমুখ সমতলসদৃশ চরিত্রের উদাহরণ। এমন টাইপ চরিত্রকে-

> অনেকেই অবজ্ঞা করেন, নিন্দাও করেন কেউ কেউ, কিন্তু এই জাতীয় একরঙা সমতলসদৃশ চরিত্রের প্রয়োজন ফুরোবে না কোনোদিন। নাটকে এই জাতীয় চরিত্রের অবকাশ সবচেয়ে বেশি, তবে উপন্যাসেও এদের গুরুত্ব কম নয়।[১০]

বস্তুত দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং দেশবিভাগের মতো অতিকায় আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতা ঐ সময়ের নানা শ্রেণির মানুষের জীবনে যে সর্বাত্মক প্রভাব রেখেছিল, উপন্যাসে লেখক এসকল টাইপ চরিত্রের জীবনবাস্তবতার মাধ্যমে তা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। রামচন্দ্র, সুরতুন, মাধাই প্রভৃতি চরিত্র অবশ্য নিখুঁত বর্তুলাকার বা পরিবর্তনশীল(Round) না হলেও জীবনসত্যের অবিকৃত উপস্থাপনার কারণে অসাধারণ ও প্রাণবন্ত। কাহিনির স্বাভাবিক শৃঙ্খলা রক্ষা করেও লেখক চরিত্রগুলোর অন্তরের অন্তঃস্থল পাঠকের কাছে উন্মোচন করতে পেরেছেন।

সান্দার সুন্দরী সুরতুন *গড় শ্রীখণ্ড*-এর অন্যতম প্রধান নারীচরিত্র। ব্রাত্যজীবনের উপস্থাপনায় অমিয়ভূষণের যে কৃতিত্ব সুরতুন চরিত্রটি সে অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। লেখক নিজেও এ চরিত্রটি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর অন্যতম প্রিয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আজন্ম অবহেলিত, ক্ষুধাক্লিষ্ট, পিতৃমাতৃহীন সুরতুন প্রথম যৌবনে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। এই দুঃসহ স্মৃতি তার অবচেতনায় পুরুষের প্রতি ভীতি সৃষ্টি করে। উপন্যাসে সুরতুনের ভাবলোক ও ক্রিয়াশীলতায় কার্যকারণ সম্পর্কে এই ভীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই ভয়ের কারণেই দুর্ভিক্ষের দিনে অনাহারক্লিষ্ট, মৃতপ্রায় সুরতুনকে সেবা শুশ্রূষা ও আশ্রয় দিয়েছিল, এমনকি চালের ব্যবসায়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছিল যে মাধাই, সেই মাধাইয়ের সঙ্গে সুরোর 'সেবা-পরিচর্যা ও প্রীতিসহৃদয়তার হৃদয়ানুকূল সম্পর্কটি প্রেমে পরিণতি লাভ'[১১] করতে পারেনি। চালের ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার পর মাধাই সুরোকে যে নির্ভরতা দিয়েছে এবং যে স্নেহসিক্ত আচরণ করেছে তার জন্য সুরতুন মনে মনে মাধাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে। কিন্তু তার মনে থাকা পুরুষের প্রতি ভীতিকে দূর করার আগেই মাধাইয়ের এষণাতাড়িত আচরণ 'মাধাই-সুরতুন' সম্পর্কের সম্ভাবনাটিকে বিনষ্ট করেছে। উপন্যাসের পনেরো পরিচ্ছেদে আছে তাদের সম্পর্কের সেই চূড়ান্ত অবস্থাটির কুশলী বর্ণনা।-

> সার্কাসে যাবার জন্য পোশাক পরে ফিরে দাঁড়িয়ে সুর্মা-আঁকা চোখজোড়া দেখে মাধাই যেন তারই আকর্ষণে এগিয়ে গেলো সুরতুনের দিকে। আকস্মিক দুর্দম্য কামনায় মাধাই সুরতুনের সুগঠিত অবয়ব ছাড়া অন্য সবই বিস্মৃত হয়ে গেলো। উদ্বেল অবস্থাটা কেটে গেলে মাধাই লক্ষ্য করলো সে তখনো ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, যে কুপিটা দরজার কাছে ছিলো সেটা ছিটকে পড়ে খুলে গিয়ে দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে। সুরতুন নেই।[১২]

এভাবে সুরতুন ও মাধাইয়ের মধ্যে তৈরি দূরত্ব থেকে যায় উপন্যাসের শেষাবধি। উপন্যাসের শেষে পদ্মার প্লাবনের দিনে অসুস্থ মাধাইকে বাঁচানোর সর্বশেষ চেষ্টা করে সুরতুন, কিন্তু বাধাঁ হয়ে দাড়াঁয়

বিরুদ্ধ প্রকৃতি। তাছাড়া সুরোর প্রতি ইয়াজের আকর্ষণ ও দায়িত্ববোধ যোগ করে সম্পর্কের নতুন মাত্রা। দুঃখের অংশীদার হয়ে ইয়াজ একটু একটু করে সুরতুনের অবচেতনায় থাকা ভীতিকে জয় করেছে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের ভাষায়:

> কিন্তু ইয়াজ তাকে উইন করছে কীভাবে? চলো, আমি তোমাকে তোমার প্রেমিকের কাছে নিয়ে যাব, মাধাই বন্যায় ডুবে যেতে পারে, তুমি একলা যেতে পারবে না... এই বলে তার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে বন্যার জলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে।[১৩]

মাধাই বন্দর দিঘা রেলস্টেশনের একজন রেলওয়ে পোর্টার। সে গরুকে বিষ দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত। রেলওয়ের চাকরি তাকে আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে মাধাইয়ের চোখে বিশ্ব ধরা পড়ে নতুন রূপে। তার মনে হয়, 'খাকি, খাকিই হচ্ছে এই দুনিয়ার সেরা রঙ।'[১৪] মাধাইয়ের মাঝে পরোপকারী ও জীবনমুখী ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে সুযোগ ছিল তা নিঃশেষ হয়েছে তার ইচ্ছা ও স্বভাবের দ্বৈরথে। দুর্ভিক্ষের ফলে উন্মূলিত ফতেমা ও সুরতুনকে যেভাবে সে সহযোগিতা করেছে তা নিঃসন্দেহে মানবিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় সে সুরতুনের প্রতি একনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারেনি। সুরতুনকে সে স্নেহ, ভালোবাসা ও আশ্রয় দিয়েছে কিন্তু তার মনের ভীতি ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার মতো সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব ও ধৈর্য না থাকায় সুরতুনকে সে জয় করতে পারেনি। সুরতুন নিজেকে আত্মিকভাবে নিবেদন করার আগেই মাধাই তাকে জৈবিকভাবে পেতে চেয়েছে। এর ফলে তাদের সম্পর্কের মাঝে যে ব্যবধান তৈরি হয়েছে তা দূর করার সযত্ন প্রয়াসও মাধাই করেনি। বরং অনুশোচনা বোধ থেকে কাশী গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে এসেও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে জৈবিকতার পঙ্কিল স্রোতে; আশ্রয় করেছে ভাসমান স্বৈরিণী নেশাগ্রস্ত চাঁদমালাকে। পরিণামে নেমে এসেছে যৌনব্যাধির গলিত জীবন। মালবাবু ও রেলকলোনি স্কুলের মাস্টারমশাই এর সান্নিধ্যে মাধাই ট্রেড ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকেছিল এবং অনুভব করেছিল জীবনের অর্থ। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের রাজনীতিতে সে স্থির হতে পারেনি। স্থির হতে পারেনি কারণ-

> মাধাই বাঁশিআলা। সে দুঃস্থ। ফলে লুম্পেন প্রলেটারিয়াট পর্যায়ে নেমে যায়। সে বাবুদের শিখানো ট্রেড ইউনিয়নে সহজে সিদ্ধি পায় কারণ যেখানে সে কাজ করে তারা সকলেই তার শ্রেণির। কিন্তু বাবুরা আর সে এক নয়। বাবুরা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বোঝে না। সে যাদের organise করে তারা তার কথায় উদ্বুদ্ধ হয় কারণ সে তাদের সমশ্রেণির। কিন্তু সে বাবুদের কথায় উদ্বুদ্ধ থাকতে পারে না।[১৫]

চিকন্দির রামচন্দ্র মণ্ডল *গড় শ্রীখণ্ড*-এর সব চাইতে শক্ত চরিত্র। উপন্যাসের চারটি আখ্যানবৃত্তের প্রতিটিতে তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। লেখক অতি যত্নে সমাজ ও সময়ের সঙ্গে ব্যক্তি রামচন্দ্রের দ্বন্দ্বের বিষয়টি অঙ্কন করেছেন। নিজের মণ্ডলীর কৌশলে যে রামচন্দ্র একসময় মাধাইকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করেছিল ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ সেই রামচন্দ্রের কন্যা সন্তানকে কেড়ে নেয়। শারীরিক গঠনের বৃহতত্ব, হাঁটার ব্যতিক্রমী ভঙ্গি এবং ঘন ঘন মস্ত দ্বিখণ্ডিত গোঁফ চারিয়ে দেওয়ার মুদ্রাদোষ তাকে গ্রামের চাষিদের মাঝে বিশিষ্ট করে তোলে। এমন বৈশিষ্ট্যের কারণে সে সান্যাল মশাই এর স্নেহধন্য, এমনকি কৃষকদের মুখপাত্র রূপে জমিদারের নিকট সমস্যা উপস্থাপনের দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত। ঔপন্যাসিকের ভাষায়:

> খাজনা দেওয়ার সময় এমন ভাব দেখায়, যেন আরো বেশি খাজনা দিতে পারলেই সুখী হবে। তার কথাবার্তায় চালচলনে একটা নাটকীয়তা আছে।[১৬]

রামচন্দ্র অতীতের মাঝে বেঁচে থাকতে পছন্দ করে। কলকাতা শহর থেকে বহুদূরের 'হিন্টারল্যান্ড' চিকন্দির অধিবাসী নয় যেন সে। তার কাছে আজও চিকন্দি যেন অতীতের গড় শ্রীখণ্ড। ন্যায়বিচারের প্রশ্নে আদালতের চেয়ে জমিদার সান্যালমশাই এর ওপর তার বেশি ভরসা। মেয়ের মৃত্যু তাকে

অনেকটাই জীবনবিমুখ করে দেয়। তার বদ্ধমূল ধারণা জমির লোভই তার মেয়েটির মৃত্যুর কারণ। তবু মেয়ের মৃত্যুর পরেও জামাইকে সে পিতৃস্নেহে আগলে রাখে ।

শ্রীকৃষ্টদাস, পদ্ম ও ছিদামের জটিল সম্পর্কের মাঝে তার অনুপ্রবেশ ছিদামের মৃত্যুর কারণ। এর ফলে অনুশোচিত ও হতোদ্যম মানসিকতায় রামচন্দ্র স্ত্রী সনকাকে নিয়ে তীর্থের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ চলে যায়। নবদ্বীপের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে রামচন্দ্র-সনকার দাম্পত্যজীবন মধুর হয়ে ওঠে। কিন্তু মানবচরিত্রের আখ্যান সবসময় যে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ঘটে না; রামচন্দ্র চরিত্রটি তার চমৎকার উদাহরণ। লেখক এর মাধ্যমে মানবচরিত্র নির্মাণে বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। নবদ্বীপে থাকা অবস্থায় রামচন্দ্র শুনতে পায় দেশবিভাগের কথা। দেশবিভাগের ঘটনা ও ভানুমতির চিঠি রামচন্দ্রকে টেনে নিয়ে আসে চূড়ান্ত পরীক্ষায়। গ্রামে ফিরে সে ক্রমশ আবিষ্কার করে মুঙলা ও পদ্মের অবৈধ সম্পর্কের বিষয়টি। উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে রামচন্দ্র নিজের পুত্রতুল্য জামাই মুঙলাকে বিধবা পদ্মের কবল থেকে রক্ষার জন্য পদ্মকে নিজের রক্ষিতা হওয়ার প্রস্তাব দেয় : 'পদ্ম, এখন থিকে লোকে জানুক তুমি রামচন্দ্র মণ্ডলের।'[১৭] সন্তানের মঙ্গলকামনায় রামচন্দ্রের এমন সর্পিল পথ অবলম্বন *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র গোপালের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু গোপালও রামচন্দ্র চরিত্র দুটির ব্যবধান অনেক। রামচন্দ্র চরিত্রটি সম্পর্কে অমিয়ভূষণ মজুমদারের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> রামচন্দ্র যা করেছে, খেতের আলের মুখে উদ্দালকের নিজের শরীর স্থাপন করার মতো। সে সাপ থেকে, এক অদ্ভুত সর্বগ্রাসী প্রাণশক্তির সঙ্গে লড়তে চায়। লক্ষ করেছেন কি রামচন্দ্রের স্ত্রীর নাম সনকা আর যাকে সে সন্ধ্যার পর দেখা করতে নিষেধ করেছে, চুল কেটে ফেলতে বলেছে, তার নাম পদ্ম? রামচন্দ্রের উপরে প্রভাব আছে চাঁদসদাগরের।[১৮]

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ থেকে দেশবিভাগ পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক ঘটনা ব্যক্তিমানুষ ও সামষ্টিকজীবনকে যেভাবে সামূহিক ভাঙনের মাধ্যমে উন্মুলিত করে দিয়েছিল উপন্যাসে তার অনেকটাই বর্ণিত হয়েছে রামচন্দ্রের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে। দেশবিভাগ যখন চূড়ান্ত বাস্তবতা তখন মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে দিশেহারা রামচন্দ্রের মনে হয়েছে:

> এ যেন কোনো অত্যন্ত খুঁতখুঁতে কৃষকের রোয়ার বেছন বাছাই করা। মাটি থেকে শিকড়সুদ্ধ চারাগাছগুলিকে টেনে টেনে তুলছে। কিন্তু সে কৃষক যেন সাধারণ কৃষকের চাইতে কম জানে কিংবা অত্যন্ত বেশি জানে। চারাগুলিকে বারে বারে তুলছে আর লাগাচ্ছে, আর লাগানোর আগে চারাগুলির কোমলতম শিকড়ে যে মাটিটুকু লেগে থাকে আছড়ে আছড়ে সেটুকুও ঝেড়ে ফেলছে। অহহ। একবার না, তিনবার। সেই দুর্ভিক্ষ, তারপর দাঙ্গা, তারপর এই দেশভাগ।[১৯]

রামচন্দ্র *গড় শ্রীখণ্ড*-এর প্রকৃত ভূমিপুত্র: অমিয়ভূষণ মজুমদারের চরিত্রচিত্রণ দক্ষতার অনুপম প্রকাশ।

পদ্ম চরিত্রটিতে বাঙালি কৌম অবচেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। দুই বার বৈধব্যের শিকার পদ্ম বাধ্য হয়ে শ্রীকৃষ্টের আশ্রয় নিয়েছে, কিন্ত বিগত যৌবন শ্রীকৃষ্টের প্রতি তার মনে কোন উত্তাপ সৃষ্টি হয়নি এবং কোন সম্পর্কও তৈরি হয়নি তাদের মধ্যে। শ্রীকৃষ্টকে সে সেবা-শ্রুশ্রূষা করেছে দাযিত্ববোধ থেকে। বরং শ্রীকৃষ্ট-পুত্র ছিদামের সঙ্গে তার তৈরি হয়েছে সহৃদয় সম্পর্ক। দীপ্ত পৌরুষের প্রতি পদ্মের অবচেতনায় আছে দুর্মর আগ্রহ। এই দুর্মর আকাঙ্ক্ষার কারণে সে বারবার রামচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। রামচন্দ্রের ভর্ৎসনায় ছিদামের আত্মহত্যার পর উন্মোচিত হয়েছে পদ্মর মনের সেই গহিন প্রান্ত- 'সে বললো,'পাপ ছিলো আমার মনে। চোখের সামনে আপনে, যেন্ সংসারে টানতেন। লোভ লাগতো।'[২০] রামচন্দ্রের প্রতি এই আকর্ষণ পদ্ম চরিত্রটকে বহুমাত্রিক করে তুলেছে। তার হৃদয়ে তৈরি হয়েছে একাধিক বোধ ও বৃত্তির সংঘাত। ঝড়ের দিনে সে মাতৃস্নেহে ছিদামকে বুকে টেনে নিয়েছে, কৃষিকাজে সহযোগিতা করেছে, কৃষ্টদাসকে সেবা করেছে আবার তারই লিবিডো ভাবনা বিপন্ন করেছে পরিবারটিকে। অন্যদিকে রামচন্দ্র

নবদ্বীপ চলে গেলে তার প্রতি পদ্মের অবচেতনায় বিদ্যমান আর্কষণ জৈবিক এষণার বঙ্কিম পথে মুঙলাকে আকৃষ্ট করেছে। রামচন্দ্রকে লেখা ভানুমতির চিঠিতে আছে তার পরিচয়:

> পদ্ম সাপের পাকের মতো জড়িয়ে ফেলেছে সংসারটাকে। সারা দিনরাতে মুঙলা পদ্মর সঙ্গে পাঁচবার দেখা করতে যায়, ভানুমতির সঙ্গে দুটো কথা বলে কিনা সন্দেহ।[২১]

রামচন্দ্র অবশ্য নিজেকে বিপন্ন করে হলেও পদ্মর কবল থেকে মুঙলাকে রক্ষা করেছে। পদ্মও রামচন্দ্রের কথা শুনে তার চুল কেটে ফেলেছে। সাদা থান না পড়লেও শাড়ির পাড় ছিঁড়ে ফেলেছে। সন্তানকে বাঁচানোর জন্য *মনসামঙ্গল* কাব্যে চাঁদ সওদাগর দেবী মনসার পূজা দিয়েছিল ভক্তিহীনভাবে, একান্ত বাধ্য হয়ে। আর *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে সন্তানতুল্য মুঙলাকে রক্ষা করতে রামচন্দ্র পদ্মকে যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে আর যাই থাক শ্রদ্ধা নেই মোটেও। বস্তুত দেবী মনসাকেন্দ্রিক বাঙালি কৌম চেতনার রূপায়ণ পদ্ম চরিত্রটি। তবে কৌমচেতনার বাইরে এসে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখলে উপন্যাসের শুরুর দিকে পদ্ম চরিত্রটির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উন্নীত হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ছিদাম-শ্রীকৃষ্টের সংসার কিংবা চিকন্দির মতো কৃষিকেন্দ্রিক অশিক্ষিত সমাজে তা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

ছিদাম ও মুঙলা চরিত্র হিসেবে ততটা বিকশিত নয়। চৈতন্য সাহার মতো শোষকের বিরুদ্ধে গান গেয়ে জনমত সৃষ্টি তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রান্ত। কিন্তু যে বোধ থেকে ছিদাম আত্মহত্যা করেছে তা তার চেতনা, রুচি ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সান্যালমশাই ও অনসূয়া যতটা ভাবেন ততটা ক্রিয়াশীল নন। গড় শ্রীখণ্ডের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ক্রমশ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাদের এক ছেলে রূপনারায়ণ ইংল্যান্ড গিয়েছে ডাক্তার হতে, অন্য ছেলে কলকাতার ট্রেড ইউনিয়নের রাজনীতিতে যুক্ত হবে। এমন বাস্তবতায় দীর্ঘপরিসরে সান্যাল-অনসূয়া দাম্পত্যজীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হলেও তাতে প্রাণোচ্ছ্বাস নেই। 'তাঁহাদের কথাবার্তায় জীবনঘনিষ্ঠতার পরিবর্তে পুঁথি-এবং প্রথানির্ভর, নিরুত্তাপ সাহচর্যের স্পর্শটি অনুভূত হয়।'[২২] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন সান্যালমশাই কিন্তু দেশভাগের প্রসঙ্গ যখন প্রত্যক্ষ বাস্তবতা তখন তাঁর ভাবনাস্রোতে স্পষ্ট হয় গ্রামের সঙ্গে এসকল পরাশ্রয়ী জমিদার শ্রেণির সম্পর্কের শিথিলতা। যেমন:

> নিঃসঙ্গ নয় শুধু, পরাজিতও মনে হচ্ছে নিজেকে। চিন্তার এই পটভূমিকায় নতুন করে বাড়িঘর তৈরি করা হাস্যকর কিছু বলে মনে হলো। দাঙ্গায় যে দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন তা যেন নাটকীয়তার চূড়ান্ততা। লালকাপড় পেঁচিয়ে পরে যেন-বা যাত্রাদলের রাজা সেজেছিলেন তিনি।[২৩]

দেশভাগের পর নিজ অঞ্চলে থেকে যাওয়ার কোনো চেষ্টা করেনি তারা। গ্রামের সঙ্গে তাদের হৃদয়ের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আগেই। ধান-পাটের হিন্টারল্যান্ড চিকন্দি নয় শহর কলকাতা-ই তাদের আসল ঠিকানা।

অনসূয়া চরিত্রটির নির্মাণ-ভাবনায় লেখকের মাতৃস্মৃতি জড়িত। চরিত্রটি একমাত্রিক। শুরু থেকেই তার প্রবৃত্তি ও বোধের কোনো পরিবর্তন হয়নি। অমিয়ভূষণ মজুমদারের মতে,

> আমার মা জ্যোতিরিন্দু দেবীকে গড় শ্রীখণ্ড উপন্যাসে অনসূয়া চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।[২৪]

উপন্যাসে আধুনিক কালের প্রতিনিধি সুমিতি ও নৃপনারায়ণের সম্পর্কের জটিলতার যে কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা অসঙ্গতিপূর্ণ। রাজনৈতিক আদর্শের সাময়িক মোহভঙ্গ তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের শিথিলতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু নৃপনারায়ণ রাজনৈতিক কারণে অন্তরীণ থাকা অবস্থাতেও সুমিতির মনে বিচ্ছেদ-বেদনার অনুরণন লক্ষ করা যায় না। সুমিতির নির্লিপ্ততার বিপরীতে দাদা নৃপনারায়ণের প্রতি সান্যালবাড়ির আদরিণী মনসার মনে যে ভালোবাসার উত্তাপের কথা বলা হয়েছে তা অনেক বেশি যৌক্তিক।

উপন্যাসের আলেফ সেখ চরিত্রটি পাঠকের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। শুধু যৌন এষণা নয় বরং সম্পত্তি ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষা যে কী বিষমভাবে মানুষকে তাড়িত করে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আলেফ সেখ। সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে মুক্ত না হলেও সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ঘৃণা করে। কলকাতায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তার সন্তান সাদেক নিহত হয়। ডাক্তার সে। রাস্তা থেকে আহত মানুষকে কুড়িয়ে আনতে গিয়ে প্রাণ যায় তার। কিন্তু উপন্যাসের উপান্তে পদ্মার প্রলয়ংকারী বন্যার পরে সময়কে অতিক্রম করে জীবন যখন নতুন রূপে সুরতুন ও ইয়াজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে তখন দেখা যায়:

> সেই আলেফ সেখ এই বন্যা, ছেলের মৃত্যু, দেশভাগ, রাজনীতি, কিছু ভাবছে না, সে লাঠি হাতে দেখছে উপরে যে বালি পড়েছে তার কত নিচে পলিমাটি, অর্থাৎ পলিটা সরিয়ে সে চাষ করবে।[২৫]

চরিত্রের বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতা উন্মোচন এবং আখ্যানভাগের বর্ণনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণের (Point of View) ব্যবহারে *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে অমিয়ভূষণ মজুমদার নিরীক্ষাপ্রবণ। মূলত সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে বেশ কয়েকটি চরিত্রের সংবেদনময় এবং বিশ্লেষণধর্মী প্রেক্ষণবিন্দু সমীকৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। ফলে দৃষ্টিকোণের স্থানান্তর উপন্যাসটিতে যোগ করেছে বহুকৌণিক জীবনবীক্ষা। এ প্রসঙ্গে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি স্মরণীয়:

> তরুণ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমিয়ভুষণ মজুমদারই এমন একজন লেখক যিনি বহুবিধি কোণ থেকে জীবনকে দেখতে জানেন।[২৬]

গড় শ্রীখণ্ড উপন্যাসে অমিয়ভূষণ মজুমদার একটি বা দুটি দৃষ্টিকোণ চরিত্রের (Viewpoint Character) প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করেননি বরং ভিন্ন ভিন্ন আখ্যানবৃত্তে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করেছেন, যার দ্বারা ঘটনা ও চরিত্র সমূহের অতীত-বর্তমান পাঠকের নিকট উন্মোচিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে একটি পরিচ্ছেদ এমনকি একটি দৃশ্যের মাঝেও প্রেক্ষণবিন্দুর স্থানান্তর লক্ষণীয়। এটি সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য; সীমায়িত সর্বময় বর্ণনারীতিতে (Limited Omniscient) যা রীতিসিদ্ধ নয়। কারণ,

> The limited narrator can also change viewpoint characters. Not in mid-scene or even mid-paragraph, as the omniscient narrator does,[২৭]

উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে। লেখক নিজেই জানাচ্ছেন সুরতুন্নেছার বর্হিজগৎ ও অন্তর্জগতের সকল কিছু। যেমন:

> জল ও জঙ্গল নিয়ে জাঙ্গাল-বাঙ্গাল বাংলাদেশের গৈ-গাঁয়ের মেয়ে সুরো। ব্রাত্য 'সান্দার'-বংশে তার জন্ম। বাপ নেই ভাববে, মা নেই কাঁদবে। গাঁয়ের পরিসীমার সঙ্গে সম-আয়াত ছিলো তার মনের বিস্তার।[২৮]

সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে উপন্যসের চারটি কাহিনিবৃত্তের বিভিন্ন চরিত্রের আর্থসামাজিক অবস্থা, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, জীবনযাপন পদ্ধতি, বৃত্তি, অভ্যাস, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মনোজাগতিক ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় লেখক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক ও চরিত্রের ব্যাখ্যা এমনকি একাধিক চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। যেমন:

> সুরতুন ভীরু, ফুলটুসিও। শহরে থেকেও ফুলটুসি সাহসী হয়নি। এদের মধ্যে পার্থক্য এই: সুরতুন ভয় থেকে পালানোর জন্য সর্বদা চেষ্টা করেছে, ফুলটুসি কোনো কোনো ভয়ের কারণকে মেনে নিয়েছে।[২৯]

অন্যদিকে, কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে *গড় শ্রীখণ্ড*-এর প্রকৃত ভূমিপুত্র রামচন্দ্রের অবস্থান কতটা সংহত তা সহজেই অনুভব করা যায় লেখকের সর্বজ্ঞ বর্ণনায়। যেমন:

> মাটির রঙ দেখে, হাতের চেটোর মাটির ডেলা গুঁড়ো করে, জিহ্বায় স্বাদ নিয়ে জমির প্রকৃত মূল্য সে বলে দিতে পারে।[৩০]

চরিত্রের অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণেও *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে অমিয়ভূষণ মূলত সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণকে অবলম্বন করেছেন। সর্বজ্ঞ বর্ণনার নিম্নোদ্ধৃত বয়ানে ধরা পড়েছে সম্পর্কের জটিল আবর্তে বিপর্যস্ত, পরাভূত শ্রীকৃষ্টের বেদনাঘন মনস্তত্ত্ব।

> কেষ্টদাস একটি বাধ্য ছেলের মতো গেলো। কিন্তু কোনো এক অনির্দিষ্ট অসার্থকতায় তার মন সংকীর্ণ হয়ে রইলো। পদ্মর স্বাস্থ্য ও ছেলের যৌবনের পাশে তার রোগ ও বার্ধক্যজীর্ণ দেহ বারংবার তুলনার মতো মনে ফুটে উঠতে লাগলো।[৩১]

তবে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসের বর্ণনারীতি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, প্রধানত সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেও কাহিনির বিভিন্ন বাঁকে ঘটনা, চরিত্র ও প্রতিবেশ উপস্থাপনায় অমিয়ভূষণ তাঁর দৃষ্টিকোণ স্থানান্তরিত করায় কিছু চরিত্র দৃষ্টিকোণ চরিত্র (Viewpoint character)হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত হয়েছে সুরতুনের চেতনাময়, উন্মুলিত প্রেক্ষণবিন্দু। চৈত্রের রৌদ্রতপ্ত দুপুরে ছোট স্টেশন থেকে দুই ক্রোশ দূরের বন্দর দিঘার রেলকলোনিতে অবস্থিত মাধাই বায়েনের বাসার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে সুরতুন। এমন রৌদ্রদগ্ধ, কর্মক্লান্ত যাত্রাপথে সুরতুনের ভাবনালোকে উদ্ভাসিত হয় দুর্ভিক্ষের সময়ের তার জীবনবাস্তবতা, মৃতপ্রায় অবস্থায় মাধাইয়ের আন্তরিকতা, অল্পবয়সে ধর্ষিতা হওয়ার স্মৃতি, মাধাই কর্তৃক বিষ দিয়ে গোহত্যা, জ্ঞাতিবৈরিতার অভিযোগে রজব আলির হাতে নিগৃহীত হওয়ার স্মৃতি এবং চাল ব্যবসার হালহকিকত। যেমন, নিম্নোক্ত অংশে সুরতুন ফতেমার সঙ্গে নিজের জীবন বাস্তবতাকে তুলনা করেছে প্রাতিস্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে-

> কী হবে তাহলে? চালের কারবার কি বন্ধ করতে হবে? অনাহারে মৃত্যু? ফতেমার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে,আবার মনে হলো তার। ফতেমার গ্রামে ফিরলেও চলবে। ...কিন্তু তার নিজের?[৩২]

উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে দৃষ্টিকোণের স্থানান্তর ঘটে বেশ কয়েকবার। এমনকি একই অনুচ্ছেদে কথকের প্রেক্ষণবিন্দুর সঙ্গে দৃষ্টিকোণ চরিত্র হিসেবে রামচন্দ্রের অনুভূতিময় হার্দ্য প্রেক্ষণবিন্দু সমীকৃত হয়েছে। যেমন:

> চৈত্র যায় যায়, এমন সময়ে রামচন্দ্র কীর্তনে মন বসাতে পারছে না। তার জামাই মুঙলা গত বৎসর চাষের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু সে যেন দেহাতিদের কোদাল দিয়ে জমি চষার মতো হাস্যকর একটা কিছু। কী করে পারবে বলো মুঙলা। বাইশ-তেইশ বছরের একটি ছেলে অকরুণ পৃথিবীকে পুরুষ সোহাগে করুণাবতী করে তুলবে, এ সম্ভব নয়।[৩৩]

প্রেক্ষণবিন্দুর পরিবর্তনের (Shifting Point of View) দিক থেকে উপন্যাসের বত্রিশ পরিচ্ছেদটি গুরুত্বপূর্ণ। পরিচর্যারীতির দিক থেকে পরিচ্ছেদটি মনোবিশ্লেষণধর্মী। জৈবিক জীবনে পরাভূত বীতকাম শ্রীকৃষ্ট এখানে মূল্যায়ণ করছে ছিদাম ও পদ্মের সঙ্গে তার সম্পর্কের জটিলতাকে। সেখানে কথক জানাচ্ছেন শ্রীকৃষ্টের কথা, আর শ্রীকৃষ্টের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে উপস্থাপিত হচ্ছে পদ্ম ও ছিদামের সম্পর্কের নানা মাত্রা।

চিকন্দি, বুধেডাঙা, দিঘা, চরণকাশি প্রভৃতি গ্রামকে নিয়ে কাহিনির যে ভূগোল ও প্রতিবেশ তৈরি হয়েছে, সেই প্রতিবেশলালিত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বহির্বাস্তবতা (Objective Reality) উন্মোচিত হয়েছে সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে। অন্যদিকে সেসকল মানুষের অন্তর্বাস্তবতার শৈল্পিক বয়ান তৈরি হয়েছে সর্বজ্ঞ লেখকের প্রেক্ষণবিন্দু ও বেশ কয়েকটি দৃষ্টিকোণ চরিত্রের (Viewpoint

Character) প্রেক্ষণবিন্দুর সমন্বয়ে। প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহারের এই পদ্ধতিকে নরমান ফ্রায়েডম্যান 'Multiple Selective Omniscience'[৩৪] নামে অভিহিত করেছেন।

উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারে লেখক কোন বর্ণনাভঙ্গিতে উপন্যাসবিধৃত প্রতিবেশ, ঘটনা, সময় ও চরিত্র অর্থাৎ জীবনসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উপস্থাপন করবেন তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রেক্ষণবিন্দু অনুযায়ী আখ্যানভাগের পরিচর্যা রীতির(Narrative treatment) প্রয়োগ 'গড় শ্রীখণ্ডে'র অন্যতম শৈল্পিক প্রান্ত। হর্ম্যাকার প্লটে বিন্যস্ত *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক টানাপড়েন এবং সময়ের অভিঘাতের বিষয় চিত্রিত হয়েছে। সমাজ ও সময়ের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বের পরিচয় দিতে গিয়ে অমিয়ভূষণ এই উপন্যাসে মূলত দৃশ্যানুগ(Scenic technique), চিত্রাত্মক (Pictorial) এবং বিশ্লেষণাত্মক রীতি(Analytical technique) ব্যবহার করেছেন। তবে স্থান-কালের ব্যাপ্তি দ্রুততর করার প্রয়োজনে এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের প্রধান অবলম্বন, সারাংশ বর্ণনারীতি (Narrative summary).

'গড় শ্রীখণ্ডে'র মতো এপিক ফর্মের উপন্যাসে দৃশ্যানুগ পরিচর্যা (Scenic treatment) অত্যন্ত উপযোগী। কারণ, 'এপিক ফর্মের উপন্যাসে সময় ও বস্তু আয়তনের (Time and Space) বিশাল পরিসর দৃশ্যানুগ পরিচর্যার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।'[৩৫] জেন অস্টেন তাঁর বিখ্যাত *প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস* (১৮১৩), *ম্যানসফিল্ড পার্ক* (১৮১৪) প্রভৃতি উপন্যাস মূলত দৃশ্যানুগ পরিচর্যারীতির প্রয়োগ করেছেন। *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে দৃশ্যানুগ পরিচর্যারীতি ব্যবহারের মাধ্যমে অমিয়ভূষণ চরিত্রসমূহকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সংলাপ ছাড়াও চরিত্রসমূহের না বলা কথা, যা তাদের ইশারা,অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি ও আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তাও উপস্থাপন করেছেন লেখক। এর সঙ্গে চরিত্রসমূহের ক্রিয়াশীলতা প্রকাশের স্থান-কালের শৈল্পিক উপস্থাপনার মাধ্যমে লেখক আমাদের সামনে সান্যালমশাই, অনসূয়া, সুরতুন, মাধাই প্রভৃতি চরিত্রের বর্তমান জীবনের একটি শৈল্পিক মায়া (Illusion) সৃষ্টি করেছেন যেন।

উপন্যাসে যে অভিজাত বৃত্তটির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে লেখক তাদের জীবনের ডিটেইলড বর্ণনা দিয়েছেন। জীবিকার্জনের আপাত চিন্তাহীন এই পরাশ্রয়ী জমিদার শ্রেণির মানুষগুলোর জীবন মন্থর গতিতে চলে। এদের জীবন উপস্থাপনায় লেখকের অবলম্বন দৃশ্যানুগ পরিচর্যা। যেমন-

> ড্রেসিং টেব্‌লের বড়ো আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চিরুনির কয়েকটি টান দিতে না দিতে কপালের উপরে কয়েক পাক কোঁকড়ানো চুল আজ থেকে বিশবছর আগে যেমন প্রতি সন্ধ্যাতেই থাকতো তেমনি করে দুলে উঠলো। পরনের যে শাড়িটা কাজকর্ম শেষ করে ঘরে এসে পরেছিলেন সেটাও তিনি পাল্টালেন। ঘাসের চটিটা বদলে মখমলের চটি পছন্দ করে পরলেন। সান্যালমশাই ঘরে ছিলেন। হাতের বইটি মুড়ে রেখে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। 'এসো'।
>
> 'অমন করে চেয়ে থেকো না'।
>
> 'অনেকদিন পরে দেখছি বলেই বোধহয় এমন লাগছে'। সান্যালমশাই অনসূয়ার হাত দুখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'এই হৃষ্টতাবোধই আমাকে নতুন কাজে উৎসাহ দেয়'।[৩৬]

ঘটনার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনের বিপরীতে বড় বিষয়বস্তুকে ঘনীভূতরূপে উপস্থাপন করার প্রয়োজনে অমিয়ভূষণ মজুমদার 'সারাংশ বর্ণনা' (Narrative summary) রীতির সুনিপুণ প্রয়োগ করেছেন। একুশ, চৌত্রিশ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে লেখক সময়কে এগিয়ে নিয়ে ঐ সময়ের কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন সংক্ষিপ্তভাবে। যেমন:

> কালের হিসাবে তিন-চার মাস সময় পিছিয়ে গিয়ে সুমিতিদের লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মনসার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। দুমাসের ছেলেটিকে নিয়ে সে শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেছে।[৩৭]

উপর্যুক্ত অংশে কথক ঘটনাবস্তু দেখানোর (Showing) তুলনায় বলার (Telling) ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ফলে অল্প কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে তিনি কাহিনির সময়কে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

পদ্মা অমিয়ভূষণের কাছে বাঙালির 'জিনিয়াসের সিম্বল'। তাঁর মতে, 'পৃথিবীতে অনেক দেশ থাকতে পারে, যে দেশে পদ্মা নেই, সেটা আমার দেশ না।'[৩৮] আর তাই পদ্মাতীরবর্তী মানুষের জীবন-আখ্যানের ভূগোল ও প্রতিবেশ বর্ণনায় অমিয়ভূষণ মজুমদার অত্যন্ত আন্তরিক। উপন্যাসের চরিত্রসমূহ শহর কলকাতা থেকে দূরবর্তী যে গ্রামীণ প্রতিবেশে তাদের জীবন নির্বাহ করে তার বর্ণনায় লেখক মূলত চিত্রাত্মক (Pictorial) পরিচর্যারীতি অবলম্বন করেছেন। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহুস্থানে এই বর্ণনারীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন-

> ১. ব্রিজটা অত্যন্ত উঁচু, তার ধরাছোঁয়া পাওয়ার জন্য গ্রামের জমি থেকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মও উঁচু। এত উঁচু যে বড়ো- বড়ো তালগাছগুলিও পায়ের নিচে থাকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালে। সেই তালগাছগুলির পায়ের কাছে পোড়োজমির মধ্য দিয়ে গ্রামে যাওয়ার পথ।[৩৯]
>
> ২. কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাদের একটা গন্তব্যস্থান ছিলো, এখানে এসে সেটা মিলিয়ে গেছে। এখন সবকিছুই পদ্মা। আকাশে দ্যাখো, সেখানে পদ্মা প্রতিফলিত শাদা শাদা বালির পাড়ের মতো মেঘগুলিকে ঢেকে ঢেকে দিয়ে ধোঁয়াটে কালো মেঘের প্রবাহ।[৪০]

গড় শ্রীখণ্ড উপন্যাসে নাট্যরীতির (Dramatic technique) বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। মূলত নাট্যরীতিই এ উপন্যাসে দৃশ্যানুগ বর্ণনা ও চিত্রাত্মক বর্ণনার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করেছে।

বহির্বাস্তবতা এবং তা থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াশীলতা এবং মনোজাগতিক ভাবনার মিশেলে মানুষের যে সম্পূর্ণ জীবন, অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসে সে জীবনকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস-

> মানুষকে অর্ধেকের চাইতে বেশি আঁকতে গেলেই তার অবচেতন, নির্জ্ঞান, প্রাক্-মুখর মনকেও আঁকতে হয়।[৪১]

গড় শ্রীখণ্ড উপন্যাসে লেখক বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত এসকল চরিত্রের কার্যাবলির ব্যাখ্যা তাদের অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। উপন্যাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের অন্তর্জগতের বিশ্লেষণে অমিয়ভূষণের প্রধান অবলম্বন বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Analytical Technique)। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র সুরতুন মাধাইকে ভালোবেসেও বিয়ে করতে পারেনি তার অবচেতনায় থাকা পুরুষের প্রতি ভয়ের কারণে। বস্তুত, মাধাই বায়েনের সঙ্গে সুরতুনের সম্পর্কের টানাপড়েন তার অবচেতন মনের ভীতির সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কে জড়িত। অমিয়ভূষণ মজুমদার অতি যত্নে সুরতুনের সেই দ্বিধাগ্রস্ত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন:

> যখন মাধাই তাকে জামা পরিয়ে দিয়েছিলো তখন মাধাইয়ের উপস্থিতির ভয়ে সুরতুন ত্রস্ত। এখন মাধাইকে তেমন ভয়ংকর বোধ হলো না। ফলে, সেই জামা পরার ঘটনাটা মনে পড়ে সুরতুনের শরীর থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। ... ঘরের কাছে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুরতুন কী হবে কী হবে এই ভয়ে অস্থির হয়ে ইতিউতি করতে লাগলো।[৪২]

'ভাবই হোক আর মননই হোক, তার বিকাশ ভাষার আশ্রয়ে। ভাষা কতখানি শৈল্পিক হল তার পরিমাণের উপর নির্ভর করছে উপন্যাসের সার্থকতা কতখানি।'[৪৩] উপন্যাসের ভাষা প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণ অত্যন্ত নিরীক্ষাপ্রবণ। এদিক থেকে তিনি কিংবদন্তি ঔপন্যাসিক কমলকুমার মজুমদার এর সঙ্গে তুলনীয়। 'উপন্যাসের ভাষা' প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য-

> আসল কথা, উপন্যাস একটা কলা-পরিণতি। তার গদ্যকে তার থেকে আলাদা করা প্রকৃতপক্ষে যায় না।[৪৪]

এ কারণে বিষয়বস্তুর ভিন্নতায় অমিয়ভূষণের উপন্যাসসমূহে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভঙ্গি লক্ষ করা যায়। তাই 'মধু সাধুখাঁ' থেকে 'ফ্রাইডে আইল্যান্ড' কিংবা 'চাঁদবেনে' থেকে *গড় শ্রীখণ্ড* এর ভাষার পার্থক্য অনেক। এমনকি *গড় শ্রীখণ্ড*-এর 'রামচন্দ্রের পর্যায়ের ভাষা সান্যালদের পর্যায়ের ভাষা থেকে পৃথক।'[৪৫] রামচন্দ্র, সুরতুন, মাধাইদের মুখের ভাষায় পাবনার ডায়ালেক্টের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু অমিয়ভূষণ পাবনার উপভাষার সেই অংশটুকু গ্রহণ করেছেন যা সমগ্র বাংলাভাষীদের কাছে বোধগম্য হয়। এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ মজুমদার বলেন,

> আমার 'গড় শ্রীখণ্ড'তে যে-ডায়ালগ দেওয়া আছে, মনে হবে পাবনার ডায়ালেক্ট, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা পাবনার নয়।[৪৬]

উপন্যাসের ভাষা প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর শব্দের ব্যবহারে। যেমন: *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসের শেষে বিপর্যস্ত রামচন্দ্রের মুখে ব্যবহৃত 'অহহ' শব্দটিতে তার হৃদয়-বেদনার যে সুতীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে তা অন্য কোনো শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও দেশবিভাগের মতো রাজনৈতিক পটভূমি সমগ্র বাংলার জনজীবনে যে সর্বাত্মক পরিবর্তনের সৃষ্টি করেছিল অমিয়ভূষণ মজুমদার মহাকাব্যিক *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে তার শৈল্পিক উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু লেখক নিছক বৃহৎ রাজনৈতিক ঘটনার অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনায় নিজেকে সীমায়িত না রেখে উপন্যাসটিতে আরও বৃহত্তর জীবনসত্যের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক পালা পরিবর্তনের নিষ্ঠুর ও হতাশ পটভূমির মধ্য দিয়েও মানুষের জীবন কীভাবে কালাতিক্রমী হয়ে ওঠে সেটিই *গড় শ্রীখণ্ড*-এর অন্বিষ্ট বিষয়। উপন্যাসের শেষে পদ্মা যখন সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে তখন সুরতুন নিজের শরীরের মধ্যে অনুভব করে নতুন এক শরীর; মাধাইয়ের জন্য বেদনা অনুভব করেও সে শরীর ক্রমশ ইয়াজের ক্ষ্যাপা কামনার উত্তর হয়ে ওঠে। বোপিত হয় নতুন জীবনের বীজ। আজন্ম অবহেলিত সুরতুন ও ইয়াজ সার্বিক ভাঙনের মাঝেও সূচনা করে জীবনের জয়গান। 'কালের প্রতিমা' পদ্মার কালো মুখ তখনও ফুলে ফুলে উঠছে আর উপরে মেঘ ডাকছে ডডড করে। আর তেমন পরিস্থিতিতে পদ্মার কাছে লেখকের প্রার্থনা,'দয়া করো, দয়া করো।'[৪৭] কালাতিক্রমী জীবনের প্রতি এমন প্রগাঢ় ভালোবাসা, বিষয়ানুগ কাহিনিবিন্যাস, চরিত্রায়ণ, দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যারীতির যথাযথ প্রয়োগ এবং আখ্যান ও প্রতিবেশ অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসটিকে দিয়েছে কালোত্তীর্ণ উপন্যাসের মর্যাদা।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *গড় শ্রীখণ্ড* অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রথম রচিত উপন্যাস। যদিও গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় 'নয়নতারা'। *গড় শ্রীখণ্ড* 'পূর্বাশা'য় ১৬ বর্ষ: ২ সংখ্যা: জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ থেকে ১৭ বর্ষ: ১১ সংখ্যা: ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬১ সময়সীমায় প্রকাশিত হয় । গ্রন্থাকারে প্রকাশের তথ্য : *গড় শ্রীখণ্ড*, ১৩৬৩ : ১৯৫৭, নাভানা, কলকাতা।

২. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৭), পৃ.৭৫৮

৩. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ* রচনাসমগ্র, সপ্তম *খণ্ড* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯), পৃ.৫১৩

৪. অশ্রুকুমার সিকদার, "গড়শ্রীখণ্ড: ছিন্নমূলমানুষ ও আস্তিক্যবোধ", *অমিয়ভূষণ মজুমদার বিশেষসংখ্যা*, চতুর্বিংশবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা , ২০১৮, পৃ.৪৭

৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর* (কলকাতা: সাহিত্যশ্রী , ১৯৭৬) , পৃ. ৩৯৭

৬. এণাক্ষী মজুমদার, সম্পাদিত, *কথা বলতে বলতে: অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ* (কলকাতাঃ এবং মুশায়েরা,২০১৮) , পৃ. ১৫২
৭. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০১১), পৃ. ২৬০
৮. এণাক্ষী মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
৯. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০
১০. অলোক রায়, সম্পাদিত, *সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য* (কলকাতাঃ সাহিত্যলোক, ২০১৫), পৃ. ৬৫
১১. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫৮
১২. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
১৩. এণাক্ষী মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
১৪. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
১৫. এণাক্ষী মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
১৬. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮
১৮. এণাক্ষী মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
১৯. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৬
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮
২২. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫৮
২৩. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০
২৪. এণাক্ষী মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮
২৬. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯
২৭. O. Scott Card, *CHARACTERS AND VIEWPOINT,* (Ohio: Writers Digest Books, 1999), p.157
২৮. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৩৪. Norman Friedman, *"Point of View in Fiction: The Development of a Critical Concept"*, PMLA. Vol.70 ,1955, p. (1160-84)
৩৫. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ. ১৯৬
৩৬. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭
৩৮. এণাক্ষী মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৫
৩৯. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪
৪১. এণাক্ষী মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮-৯৯
৪২. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
৪৩. শিশির চট্টোপাধ্যায়, *উপন্যাস পাঠের ভূমিকা* (কলকাতাঃ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৯), পৃ. ১২৫
৪৪. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১
৪৫. এণাক্ষী মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০
৪৬. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫